بسم الله الرحمن الرحیم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৩ মার্চ, ২০২৩ মোতাবেক ০৩ আমান, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পবিত্র কুরআনের যে মা'রেফত বা তত্ত্বজ্ঞান আমাদেরকে দিয়ে গেছেন অথবা স্বীয় গ্রন্থাবলী ও বিভিন্ন বক্তব্যে এই তত্ত্ব অনুধাবন করার এবং একে বাস্তবায়নের জন্য যেভাবে তা উপস্থাপন করেছেন এর বরাতে আমি সাম্প্রতিক জুমুআয় দু'টি খুতবা প্রদান করেছি। পবিত্র কুরআন মা'রেফত বা তত্ত্বজ্ঞানের যে ভাণ্ডার আমাদের প্রদান করে, প্রকৃতপক্ষে এটিই বান্দাকে খোদার সাথে মিলিত করে। এছাড়া খোদা তা'লাকে লাভ করার (এবং) তাঁর নৈকট্য লাভের আর কোনো মাধ্যম নেই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর একটি পঙক্তিতে বলেন,

"কুরআন খোদা নুমাঁ হ্যায়, খোদা কা কালাম হ্যায়।
বে ইসকে মা'রেফত কা চমন না তামাম হ্যায়।"

(অর্থাৎ, **কুরআন হলো খোদা দর্শনের দর্পণ ও খোদার বাণী। আর এটি ছাড়া তত্ত্বজ্ঞানের বাগান অসম্পূর্ণ।"**)

অতএব, এটি সেই গূঢ় কথা যা সর্বদা আমাদেরকে নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। আমরা যদি খোদা তা'লার নৈকট্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করি, আমরা যদি নিজেদের ইহ ও পরকালকে সুন্দর করতে চাই; তাহলে এসব বিষয় স্মরণ রাখতে হবে। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র কুরআনই সেই মাধ্যম। একইসাথে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, এই মা'রেফতকে অনুধাবন করার জন্যও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং মনোনীত কোনো পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন। এ যুগে তিনি হলেন, মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)। তিনি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আঙ্গিকের প্রতি যেরূপ গভীরে গিয়ে আলোকপাত করেছেন এবং এর সৌন্দর্য সম্পর্কে অবহিত করেছেন তা আমি বিগত দুই খুতবায় বর্ণনা করেছিলাম–যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি। তাঁর বর্ণিত জ্ঞান ও তত্ত্বের এই ভাণ্ডার এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুধাবন করার এই ধারা এখনও সমাপ্ত হয় নি। বরং এখনও এ সম্পর্কে অনেক তথ্য-উপাত্ত বর্ণনা করা বাকি আছে। (তাই) আজও এই ধারা বজায় রেখে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন বক্তব্য ও রচনার আলোকে পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্যাবলী, মর্যাদা এবং গুরুত্বের উল্লেখ করব। তিনি (আ.) যত গভীরে গিয়ে আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের মর্যাদা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করেছেন তা-ই (মূলত) আমাদেরকে খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন এবং কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তবায়নের জ্ঞান ও বুৎপত্তি দান করে। অতএব, গভীর মনোযোগ দিয়ে আমাদের এসব কথা শোনা ও অনুধাবনের চেষ্টা করা উচিত, যাতে আমরা আমাদের জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারি।

পবিত্র কুরআন খোদার বাণী, একথা ব্যাখ্যা করে **লালা ভীম সিং** এর নামে প্রেরিত একটি পত্রে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেন,

“অল্প কিছুদিন আগের কথা, লেখরাম নামের একজন আর্যসমাজী ব্রাহ্মণ আমার কাছে কাদিয়ানে আসে এবং বলে, **‘বেদ খোদার বাণী, পবিত্র কুরআন খোদার বাণী নয়’**। আমি তাকে বলি, **তোমার দাবি হলো, বেদ খোদার বাণী কিন্তু আমি একে এর বর্তমান অবস্থার নিরিখে খোদার বাণী বলে বিশ্বাস করি না, কেননা এতে শির্‌ক এর শিক্ষা রয়েছে।** (যাতে শির্‌ক এর শিক্ষা থাকে তা কীভাবে খোদার বাণী হতে পারে!) **আর এছাড়া আরো অনেক অপবিত্র শিক্ষা রয়েছে কিন্তু আমি পবিত্র কুরআনকে খোদার বাণী বলে বিশ্বাস করি; কারণ এতে শির্‌কের শিক্ষা নেই আর অন্য কোনো অপবিত্র শিক্ষাও নেই। আর এর অনুসরণের ফলে জীবন্ত খোদার চেহারা দেখা যায় এবং বিভিন্ন মো’জেযা বা অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশিত হয়।**”

কাজেই, খোদা তা’লার বাণী হওয়ার শর্ত হলো, তার শির্‌কমুক্ত হওয়া আর এর ওপর আমল করার কারণে খোদা তা’লার চেহারা দৃশ্যমান হওয়া। পবিত্র কুরআন খোদার চেহারা দেখানোর ক্ষেত্রে কীভাবে স্বীয় ভূমিকা পালন করেছে, এ বিষয়টি সাহাবীদের জীবনে দেখা সম্ভব। অতএব, সাহাবীদের ওপর পবিত্র কুরআনের শিক্ষার প্রভাবের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

“মহানবী (সা.)-এর যুগ, যা ইসলামের সূচনাকাল ছিল, সে যুগের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাতে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা কীভাবে বিশ্বাসীদের উপরোক্ত তুচ্ছ পর্যায় থেকে উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে তা বুঝা যায়। কেননা, ঈমান আনয়নকারীদের অধিকাংশই নিজেদের প্রাথমিক অবস্থায় এমন ছিলেন যে, যেই অবস্থায় তারা এসেছিলেন সেই অবস্থা বন্য জন্তুদের চেয়েও নিকৃষ্ট ছিল আর হিংস্র পশুর মতো তাদের জীবন ছিল, আর এতবেশি অপকর্ম এবং অনৈতিকতায় তারা লিপ্ত ছিলেন যে, (তারা) মানবতার বাইরে চলে গিয়েছিলেন। এতটা চেতনা হারিয়ে বসেছিলেন যে, একথা বুঝতেই পারতেন না যে, তারা অপকর্মশীল। অর্থাৎ তাদের ভালো ও মন্দকে চেনার চেতনাও লোপ পায়। অতএব কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর সাহচর্য তাদের ওপর প্রথম যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা হলো, তাদের উপলব্ধি জন্মেছিল যে, আমরা পবিত্রতার পোশাক থেকে সম্পূর্ণ নগ্ন এবং অপকর্মের নোংরামিতে জর্জরিত; যেমনটি আল্লাহ্ তা’লা তাদের প্রাথমিক অবস্থার নিরিখে বলেছেন, **أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ** **(সূরা আল্ আরাফ: ১৮০)** অর্থাৎ, এসব মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর মতো বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট। এরপর যখন মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সাহচর্য এবং ফুরকানে হামীদ (তথা কুরআনের) মনোমুগ্ধকর প্রভাবের কল্যাণে তারা উপলব্ধি করে যে, আমরা যে অবস্থায় জীবন কাটিয়েছি তা এক প্রকার বন্য পশুসুলভ জীবন এবং পুরোটাই অপকর্মে কলুষিত; তাই তারা রূহুল কুদুস বা ফেরেশ্‌তার মাধ্যমে শক্তি পেয়ে পুণ্যকর্মের প্রতি অগ্রসর হন। যেমনটি আল্লাহ্ তা’লা তাদের সম্পর্কে বলেন, **وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ** (সূরা আল্ মুজাদিলা: ২৩)। খোদা তা’লা একটি পবিত্র আত্মা দ্বারা তাদের সাহায্য করেন। তা ছিল সেই অদৃশ্য ওহীর শক্তি, যা ঈমান আনার পর এবং কিছুটা ধৈর্য ধারণের পর মানুষের লাভ হয়। এরপর সেসব মানুষ এই শক্তি লাভ করে শুধুমাত্র এই অবস্থানেই থেমে থাকে নি যে, তারা নিজেদের দোষ-ক্রুটি এবং পাপসমূহের উপলব্ধি রাখবে, সেগুলোর দুর্গন্ধকে ঘৃণা করবে, বরং তারা এরপর পুণ্যের প্রতি এতটাই অগ্রসর হতে থাকে যে, পুণ্যের অর্ধেক পরাকাষ্ঠা অর্জন করে নেয় এবং দুর্বলতার মোকাবিলায় সৎকর্ম সম্পাদনের শক্তি সৃষ্টি হয়। (অর্থাৎ শুধুমাত্র দুর্বলতাই দূর করে নি বরং পুণ্যের প্রতি

অগ্রগামী হতে থাকে।) আর এভাবে এক মধ্যবর্তী অবস্থা তাদের অর্জিত হয় আর এরপর তারা রূহুল কুদুস বা ফেরেশ্‌তার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সেসব সংগ্রাম এবং চেষ্টা-সাধনায় রত হয় যে, নিজেদের পবিত্র কর্মের বদৌলতে শয়তানের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে। তখন তারা খোদাকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্তে সেসব চেষ্টা-সাধনার পথ অবলম্বন করে যার চেয়ে বেশি মানুষ ভাবতেও পারে না। তারা খোদা তা'লার পথে নিজেদের প্রাণকে খড়-কুটোর সমান মূল্যও দেয় নি। অবশেষে তারা গৃহীত হয় আর খোদা তা'লা তাদের হৃদয়ে পাপের প্রতি চরম ঘৃণা সৃষ্টি করেন এবং পুণ্যের (প্রতি) ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন।

অতএব, এই হলো, তাদের ওপর পবিত্র কুরআনের প্রভাব অর্থাৎ তারা জমি থেকে উঠে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হন। যাঁদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, তাঁদের মধ্য হতে প্রত্যেকেই তোমাদের জন্য পথপ্রদর্শক। পবিত্র কুরআন অনুসরণের ফলে মানুষ খোদা তা'লা গুণাবলীর বিকাশস্থলে পরিণত হয়। একথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

যে ব্যক্তি কুরআন করীমের অনুসারী হয়ে ভালোবাসা ও নিষ্ঠাকে পরম মার্গে উপনীত করে সে খোদা তা'লার গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়া হয়ে যায়। শুধুমাত্র অনুসরণ করা শর্ত নয়, বরং ভালোবাসা ও নিষ্ঠায় চুড়ান্ত সীমা পর্যন্ত পৌঁছানো হলো শর্ত। অর্থাৎ তাঁর আদেশ নিষেধের ওপর পরিপূর্ণরূপে আমল করতে হয় কেবল তবেই সে আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর বিকাশস্থলে পরিণত হয়। তিনি পুনরায় বলেন,

এসব ফলাফল সেই মহাশক্তি ও বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে যা খোদা তালার বাণী কুরআন শরীফের মাঝে আমরা প্রত্যক্ষ করি। এই মহাশক্তি ও বৈশিষ্ট্য অন্য কোনো কিতাবে নেই যা অন্য কোনো জাতির দৃষ্টিতে ইলহামী গণ্য হতে পারে। হয়তবা এর কারণ হতে পারে, সেই সব গ্রন্থ সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার কারণে সেগুলোতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে অথবা হয়ত সেগুলোর শব্দ পরিবর্তিত না হলেও তার অর্থ বিকৃত করা হয়েছে অথবা খোদা তা'লা শেষ যুগে এই সমস্ত বিভেদ দূর করার জন্য এবং পৃথিবীর সকল লোকদের এক কিতাবে সমবেত করার জন্য সমস্ত পূর্ববর্তী কিতাবের কল্যাণধারা উঠিয়ে নিয়েছেন। তা না হলে এর কারণ আর কী হতে পারে? যেভাবে পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.) এর সত্যিকার আনুগত্য ও অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ ওলীআল্লাহ্‌দের জামা'তভুক্ত হতে পারে সেসব গ্রন্থে এইসব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না আর এ কারণেই সেসব গ্রন্থের অনুসারীরা এই শ্রেষ্ঠত্বসমূহের অস্বীকারকারী যা মানুষ (খোদার) নৈকট্য লাভের পর অর্জন করতে পারে। বরং তারা নিদর্শন ও অলৌকিক বিষয়াদিকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। নিদর্শনকে তারা শুধু অস্বীকারই করে না, বরং সেগুলোকে তারা হাসিঠাট্টা বা বিদ্রুপ করে। আর একারণেই তারা খোদা তা'লা এবং ধর্ম থেকে দূরে সরে গেছে। পুনরায় তিনি বলেন, কিন্তু আমরা কাউকেই কোনো ঠাট্টা-বিদ্রুপ করি না। তবে তাদের বঞ্চনা দেখে আমাদের অবশ্যই কান্না পায়। তাদের প্রতি আমাদের হৃদয়ে সহানুভূতি রয়েছে যারা আল্লাহ্ তা'লা থেকে দূরে সরে গিয়ে তাঁর গুণাবলীর কথা ভুলে গিয়ে নিজেদের ভ্রান্ত আচরণকে আলোকিত চিন্তাধারা নাম দিয়ে পুনরায় পশুসুলভ আচরণ প্রদর্শন করে বেড়াচ্ছে আর এসব কিছুই আমরা আজকাল এই জগৎপূজারীদের মাঝে দেখতে পাই। যাহোক নিজের কথার ধারাবাহিকতায় তিনি বলেন,

আমি এখানে পূর্ববর্তী কোনো কাহিনী বর্ণনা করছি না, বরং আমি সেসব কথাই বলছি যা আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি। আমি পবিত্র কুরআনের মাঝে এক অসাধারণ শক্তি অনুভব

করেছি। আমি মহানবী (সা.)-এর অনুসরণের মাঝে এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করেছি। অন্য কোনো ধর্মের মাঝে সেই শক্তি ও বৈশিষ্ট্য নেই। আর তা হলো এর সত্যিকার অনুসরণকারী ওলীর পদমর্যাদায় উপনীত হয়। খোদা তা'লা তার সাথে শুধু বাক্যালাপই করেন না, বরং নিজ আচরণের মাধ্যমে তাকে দেখিয়ে দেন যে, আমি সেই খোদা যিনি পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তখন তার ঈমান উচ্চতায় সুদূর তারকারাজির চেয়েও সামনে অগ্রসর হয়ে যায়। অতএব আমি এ বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রাখি। খোদা তা'লা আমার সাথে কথা বলেন আর এক লক্ষের অধিক নিদর্শন তিনি আমার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। অতএব যদিও আমি পৃথিবীর সমস্ত নবী রসূলের সম্মান করি ও তাদের গ্রন্থেরও সম্মান করি, কিন্তু জীবন্ত ধর্ম কেবলমাত্র ইসলামকেই মনে করি। কেননা এর মাধ্যমে আমার কাছে খোদা তা'লা প্রকাশ পেয়েছেন। যে ব্যক্তি আমার এ কথায় সন্দেহ করে তার উচিত এসব কথাকে যাচাই করার জন্য আমার কাছে এসে দুই মাস অবস্থান করা। আমি তার সমস্ত ব্যায়ভার প্রদান করব যা তার জন্য যথেষ্ট হবে। তিনি বলেন, আমার দৃষ্টিতে জীবন্ত ধর্ম সেটি যা জীবন্ত এবং নিদর্শনের মাধ্যমে খোদাকে দেখাতে সক্ষম, তা না হলে শুধু ধর্মের সঠিক হওয়ার দাবি করা অর্থহীন ও প্রমাণশূণ্য। যারা তার এই দাবি থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার ছিল তারা কল্যাণমণ্ডিত হয়েছে আর তারা সফল হয়েছে। তাঁর কাছে অবস্থান করেছেন এবং তাঁকে গ্রহণ করেছেন। আজও তার এই ধর্মীয় সাহিত্য আর এসব তত্ত্বজ্ঞানের ভাণ্ডার বহু মানুষকে খোদা দর্শনের আয়নায় পরিণত করেছে। অতএব যেখানে আমরা একথা অন্যদের অবহিত করব সেখানে আমাদের নিজেদেরও সেসব থেকে পূর্ণভাবে কল্যাণমণ্ডিত হওয়া উচিত। তবেই আমরা আমাদের বয়আতের উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হবো।

এরপর কুরআন শরীফের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, কুরআন শরীফের চারটি অসাধারন নিদর্শনমূলক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলোর বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, কুরআন শরীফের নিদর্শনমূলক বৈশিষ্ট্যাবলীর মাঝে একটি হলো এর প্রাঞ্জলতা এবং সাবলীলতা যা মানবীয় বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতার সম্পূর্ণ উর্দ্ধে, কেননা মানবীয় বাগ্মিতা ও ভাষার প্রঞ্জলতার ময়দান খুবই সংকীর্ণ। আর যতক্ষণ কোনো কথায় অতিরঞ্জণ, মিথ্যা বা অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তার মিশ্রণ না হয় ততক্ষণ কোনো মানুষ বাগ্মিতা ও ভাষার প্রঞ্জলতা প্রদর্শনে সক্ষম নয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার বাণী এসব থেকে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র। এতে কোনো প্রকার মিশ্রণ নেই। দ্বিতীয়ত কুরআন শরীফের আর একটি অসাধারন নিদর্শন হলো তা যতটা কাহিনী বর্ণনা করেছে সেগুলোর সবই মূলত ভবিষ্যদ্বাণী যেগুলোর প্রতি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ইঙ্গিতও করা হয়েছে।

কুরআন শরীফের তৃতীয় নিদর্শনমূলক বৈশিষ্ট্য হলো এর শিক্ষা মানুষের প্রকৃতিকে পরম মার্গে পৌঁছানোর সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাখে আর পরিপূর্ণ বিশ্বাস অর্জনের জন্য মানুষ যেসব দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শনের মুখাপেক্ষী তার সবই এতে বিদ্যমান।

চতুর্থ একটি বড় বৈশিষ্ট্য যা এতে বিদ্যমান তা হলো এর যথাযথ অনুসরণকারীকে এটি খোদা তা'লার এমন নৈকট্যে সম্মানিত করে যে, সে খোদা তা'লার সাথে বাক্যালাপের সম্মান লাভ করে এবং প্রকাশ্য নিদর্শন তার হাতে প্রকাশিত হয় এবং সে আত্মশুদ্ধির পরম মার্গে উপনীত হয় আর কুরআন শরীফের এই গূঢ়কথা ভালোভাবে স্মরণ রাখার যোগ্য যে, পরিপূর্ণ মু'মিনের ওপর যে ঐশী নিদর্শনরূপী কল্যাণধারা বর্ষিত হয় তা আসলে খোদা তা'লার কাজ হয়ে থাকে। এটিকে কেউ নিজের যোগ্যতা আখ্যা দিতে পারে না। প্রকৃত মু'মিন এর

ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য হলো তার পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা, ঈমানের শক্তি ও অবিচলতা। উদাহরণ স্বরূপ কোনো দেয়ালে যদি সূর্যের আলো পড়ে তাহলে সেই আলো দেয়ালের কোনো ব্যক্তিগত যোগ্যতা নয়, কেননা তা সেটি থেকে পৃথকও হতে পারে। বরং দেয়ালের ভিত্তি যদি একটি মজবুত পাথরের উপর থাকে, তা যদি এত দৃঢ় ও শক্ত প্রাচীর হয় যে, প্রবল বন্যা আসলেও, প্রবল বাতাস প্রবাহিত হলেও এবং তুফানতুল্য বৃষ্টি হলেও যদি সেই দেয়াল দোদুল্যমান না হয় তবে এটিই দেয়ালের গুণ গণ্য হতে পারে।

অতএব ঈমানেরও এমন অবস্থা হওয়া উচিত। কুরআন শরীফকে খোদা তা'লার পবিত্র বাণী মনে করে এর ওপর আমলের চিত্রও এরূপ হওয়া উচিত। এটিই আমাদের ঈমানকে দৃঢ় করে, আমাদের খোদা তা'লার সাথে মিলিত করে। কোনো ঝড়, কোনো তুফান, কোনো বিরোধিতা মানুষকে তার ঈমান থেকে যেন বিচ্যুত করতে না পারে। এটি হলো মানুষের বৈশিষ্ট্য বা গুণ। সর্বদা তার ওপর যেন খোদা তা'লার বাণীর আলো বর্ষিত হতে থাকে এবং সেটিকে বোঝার চেষ্টা করতে থাকে। তারপর তিনি বলেন,

কুরআন শরীফ এমন এক কিতাব যার অনুসরণের ফলে দোয়া গৃহীত হয়। তিনি বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন, কুরআন শরীফের নিদর্শনমূলক একটি প্রভাব হলো এর পরিপূর্ণ অনুসরণকারীরা কবুলিয়্যতের মর্যাদা লাভ করে আর তাদের দোয়া গৃহীত হয় এবং খোদা তা'লা তা গ্রহণ করে নিজের সুমিষ্ট ও প্রতাপান্বিত বাণীর দ্বারা তাদেরকে অবগত করেন আর বিশেষত শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করেন এবং সাহায্যের নিদর্শনস্বরূপ বিশেষ বিশেষ অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন।

পবিত্র কুরআনে সব রকম পথনির্দেশনা রয়েছে– এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

আরবের মুশরেকদের মতো সেদেশের আহলে কিতাবরাও অপরাধী হয়ে গিয়েছিল। খ্রিষ্টানরা তো প্রায়শ্চিত্তবাদের ওপর জোর দিয়ে এবং এটির ওপর নির্ভর করে একথা ভেবে বসেছিল যে, 'আমাদের জন্য সবরকম পাপাচার বৈধ'। আর ইহুদিরা বলত, 'আমরা অপরাধ করলেও মাত্র কয়েকদিন দোযখে থাকব, তার বেশি নয়।' যেমন কিনা এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِى دِينِهِم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ (আলে ইমরান: ২৫)

অর্থাৎ, তাদের এই দুঃসাহস এজন্য সৃষ্টি হয়েছিল যে, তারা বলত; (অর্থাৎ তারা যেসব অপকর্ম করছে, তা করার সাহস কেন পেল? তা একারণেই যেমনটি আমি এই আয়াতে পাঠ করেছি– তারা বলতো,) দোযখের আগুন যদি আমাদের স্পর্শ করেও তবে তা কেবল কয়েকদিনের জন্য হবে। তারা যেসব মিথ্যাচার করে এই ঔদ্ধত্যের কারণেই করে। বস্তুত যখন আরবের আহলে কিতাব ও মুশরেকরা চরম পর্যায়ের পাপাচারী হয়ে গিয়েছিল এবং পাপ করেও মনে করত, 'আমরা পুণ্যের কাজ করেছি' এবং অপরাধ থেকে বিরত হতো না ও সার্বজনীন শান্তি ও নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছিল, তখন খোদা তা'লা স্বীয় নবীর হাতে শাসনক্ষমতার লাগাম দিয়ে তাদের হাত থেকে দরিদ্র-অসহায়দের রক্ষা করতে মনস্থ করেন। যেহেতু আরব জাতি লাগামহীন ছিল এবং তারা কোনো রাজার রাজত্বের অধীন ছিল না, সেজন্য প্রতিটি দল অত্যন্ত অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করত। তাদের জন্য যেহেতু কোনো বিচারব্যবস্থা ছিল না সেজন্য তাদের অপরাধের মাত্রা বেড়েই চলছিল। তাই আল্লাহ্ সেই দেশের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে মহানবী (সা.)-কে কেবল সেই দেশের জন্য রসূলরূপেই

পাঠান নি, বরং সেদেশের বাদশাহও বানিয়ে দেন এবং পবিত্র কুরআনকে এমন এক জীবনবিধানরূপে পরিপূর্ণ করেন যার মাঝে দেওয়ানি, ফৌজদারি, অর্থনৈতিক– সব ধরনের পথনির্দেশনা বিদ্যমান। তাই মহানবী (সা.) একজন বাদশাহ হিসেবে সবগুলো দলের শাসক ছিলেন এবং সব ধর্মের মানুষ তাদের মামলা-মোকদ্দমা তাঁকে (সা.) দিয়ে বিচার করাতো। পবিত্র কুরআন থেকে সাব্যস্ত হয়, একবার জনৈক মুসলমান ও জনৈক ইহুদির মামলা মহানবী (সা.)-এর আদালতে আসে, তখন তিনি (সা.) তদন্তের পর ইহুদির দাবি সঠিক বলে সাব্যস্ত করেন এবং তার পক্ষে (সেই) মুসলমানের বিরুদ্ধে রায় দেন। অনেক মূর্খ বিরুদ্ধবাদী, যারা পবিত্র কুরআন মনোযোগের সাথে পড়ে না, তারা সবগুলো বিষয়ই মহানবী (সা.)-এর রেসালতের অধীনে নিয়ে আসে, অথচ এরূপ শাস্তি খিলাফত তথা বাদশাহর অবস্থান থেকে দেয়া হতো।

পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে পবিত্র জীবন লাভের বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে আরেক স্থানে তিনি (আ.) বলেন,

এটি জানা কথা, প্রত্যেকটি জিনিসের বড় সৌন্দর্য এটিই মনে গণ্য করা হবে যে, যে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তা বানানো হয়েছে সেই উদ্দেশ্য যেন সর্বোত্তমরূপে পূরণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো বলদ হাল চালানোর জন্য কেনা হয় তবে সেই বলদটির এই বৈশিষ্ট্যই দেখা হবে যে, তা লাঙল টানার কাজ উত্তমরূপে করতে পারছে কিনা। (বলদ লাঙল টানার জন্যই নেয়া হয়, তাই সেটিকে লাঙল টানার কাজেই ব্যবহার করা হবে এবং ভালো লাঙল টানা বলদটিকে ভালো মনে করা হবে।) অনুরূপভাবে এটিও জানা কথা, ঐশীগ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য এটিই হওয়া উচিত যে, তা এর অনুসারীদেরকে স্বীয় শিক্ষা, প্রভাব, সংশোধনী শক্তি ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা সবরকম পাপ ও অপবিত্র জীবন থেকে মুক্ত করে যেন এক পবিত্র জীবন দান করে। আর পবিত্র করার পর খোদাকে চেনার জন্য এক পরিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি দান করে এবং সেই অতুলনীয় সত্তার সাথে ভালোবাসা ও প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করে যিনি যাবতীয় আনন্দের উৎসস্থল। কেননা প্রকৃতপক্ষে এই ভালোবাসাই মুক্তির মূল এবং এটিই সেই স্বর্গ যেখানে প্রবেশ করার পর সকল দুঃখকষ্ট, তিক্ততা ও জ্বালাযন্ত্রণার অবসান ঘটে। নিঃসন্দেহে জীবন্ত ও পরিপূর্ণ ঐশীগ্রন্থ সেটিই যা খোদান্বেষীকে এই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয় এবং তাকে হীন জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে সেই প্রকৃত প্রেমাস্পদের সাথে মিলিত করে যাঁর সাথে মিলনই প্রকৃত মুক্তি। আর তা সকল সন্দেহ ও সংশয় থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে এমন পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান তাকে দান করে যেন সে নিজ খোদাকে দেখতে পায়। আর খোদার সাথে এমন দৃঢ় সম্পর্ক তাকে দান করে যেন সে খোদার বিশ্বস্ত বান্দায় পরিণত হয়। আর খোদা তার প্রতি এত দয়া ও কৃপা করেন যেন তাঁর যাবতীয় সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন দ্বারা তার ও তার বিরোধীদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেখান এবং স্বীয় তত্ত্বজ্ঞানের দুয়ার তার জন্য অবারিত করে দেন। যদি কোনো গ্রন্থ নিজের এই দায়িত্ব পালন না করে যা তার প্রকৃত দায়িত্ব এবং অন্যান্য বৃথা দাবিসমূহ দ্বারা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চায়, তবে তার তুলনা সে ব্যক্তির সাথে করা যায় যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হবার দাবি করে এবং যখন কোনো রোগী তার সামনে আনা হয় যে, তাকে সুস্থ করে দেখাও, তখন সে উত্তর দেয়, আমি তাকে সুস্থ করতে না পারলেও আমি খুব ভালো কুস্তি লড়তে জানি; কিংবা বলে, আমি জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রে খুব ভালো দখল রাখি। জানা কথা, এমন ব্যক্তিকে সবাই ভাঁড় বলবে এবং বুদ্ধিমানদের কাছে সে তিরস্কারযোগ্য বলে গণ্য হবে। পৃথিবীতে খোদার কিতাব ও খোদার

রসূল আসার মূল উদ্দেশ্যই হয়ে থাকে পৃথিবীকে পাপ ও পঙ্কিলতার জীবন থেকে মুক্ত করা এবং খোদার সাথে পবিত্র বন্ধন স্থাপন করা। মানুষকে জাগতিক জ্ঞান শেখানো ও পৃথিবীর নিত্যনতুন আবিষ্কারের বিষয়ে অবগত করা তো তাদের উদ্দেশ্য হয় না।

মোটকথা একজন বুদ্ধিমান ও ন্যায়পরায়ণ মানুষের জন্য একথা বুঝা কোনো কঠিন ব্যাপার নয় যে, ঐশীগ্রন্থের দায়িত্ব এটিই যে, তা খোদা পাইয়ে দেবে, খোদার সত্তা সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছে দেবে ও খোদার মাহাত্ম্য ও প্রতাপ হৃদয়ে প্রোথিত করে পাপকর্ম করা থেকে বিরত করবে। নতুবা আমরা এমন কিতাব দিয়ে কী করব যা হৃদয়ের পঙ্কিলতাও দূর করতে পারে না এবং এমন পবিত্র ও পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বজ্ঞানও দিতে পারে না যা পাপের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির কারণ হতে পারে? স্মরণ রাখতে হবে, পাপের প্রতি আকর্ষণের কুষ্ঠ অত্যন্ত ভয়ংকর এক কুষ্ঠ এবং এই কুষ্ঠ কোনোভাবে দূর হতেই পারে না, যতক্ষণ না খোদার জীবন্ত তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতির্বিকাশ এবং তাঁর প্রতাপ, মাহাত্ম্য ও সর্বময় ক্ষমতার নিদর্শন বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হয় ও যতক্ষণ না মানুষ খোদাকে তাঁর সর্বব্যাপী শক্তি সহকারে এতটা নিকটে দেখতে পায় যেমনটি কোনো ছাগল তার থেকে মাত্র দুই পা দূরে বাঘকে দেখতে পায়। মানুষের জন্য এটি আবশ্যক যে, সে যেন পাপের বিধ্বংসী উত্তেজনা থেকে পবিত্র হয় এবং খোদার মাহাত্ম্য তার হৃদয়ে এতটা প্রোথিত হয়ে যায় যে, সেই নিরুপায় করে দেয়া প্রবৃত্তির কামনাবাসনার উত্তেজনা, যা বজ্রপাতের ন্যায় আপতিত হয়ে তার তাকওয়ার পুঁজি একেবারে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়– তা দূর হয়ে যায়। কিন্তু সেসব অপবিত্র উত্তেজনা যা মৃগীরোগের মতো বারবার আক্রমণ করে এবং ধার্মিকতার চেতনাকে লুপ্ত করে দেয়, তা কি কেবল নিজের কল্পনাপ্রসূত পরমেশ্বরের ধারণা দ্বারা দূর হতে পারে বা কেবল নিজের মনগড়া চিন্তাভাবনা দ্বারা অবদমিত হতে পারে, কিংবা এমন কোনো প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা থামতে পারে যার কষ্ট তার আত্মাকে স্পর্শও করে নি? কখনোই না! এটি তুচ্ছ কোনো বিষয় নয় বরং একজন বুদ্ধিমানের নিকট যেকোনো বিষয়ের চেয়ে প্রণিধানের অধিক যোগ্য বিষয় এটিই যে, সেই ধ্বংস যা এই ধৃষ্টতা ও সম্পর্কহীনতার কারণে সৃষ্টি হয়, যার প্রকৃত মূল হলো পাপ ও অবাধ্যতা– তাথেকে কীভাবে নিরাপদ থাকবে। এটি জানা কথা, মানুষ নিশ্চিত তৃপ্তি ও আনন্দকে শুধুমাত্র অনুমাননির্ভর ধারণার ভিত্তিতে পরিত্যাগ করতে পারে না। [কিছু সুখানুভূতি সুনিশ্চিত যা সে লাভ করে থাকে। এর বিপরীতে তাকে একথা বলা যে, (আধ্যাত্মিক আনন্দ) পাবে; কেবল ধারণার ভিত্তিতে বলা যে, ইনশাআল্লাহ্ আমরা (আনন্দ) পাব, পরবর্তীতে পাব। কিন্তু কবে পাব, কীভাবে পাব? এই ভরসায় তো (আগেরটি) সে ছাড়তে পারে না!) তবে হ্যাঁ, একটি নিশ্চিত বিষয় আরেকটি নিশ্চিত বিষয় ছাড়াতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ এক বন বা জঙ্গলের বিষয়ে যদি নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে যে, সেখানে গেলে আমরা অনেক হরিণ শিকার করতে পারব আর আমারা এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত থাকি, কিন্তু যখন অপর একটি বিশ্বাসও স্থান করে নেয় যে, সেখানে ৫০টি সিংহ রয়েছে আর হাজার হাজার বিষধর সাপ ওৎ পেতে রয়েছে, তখন আমরা সেই অভিপ্রায় ত্যাগ করব। একইভাবে সেই মানের দৃঢ় বিশ্বাস ব্যাতিরেকে পাপও দূরীভূত করা সম্ভব নয়। পাপ দূরীভূত করার উপায় হলো এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকা যে, পাপ করলে সাময়িক আনন্দ উপভোগ করা হবে ঠিকই, তবে সেই পাপ করলে ব্যাপারটি এমন দাঁড়ায় যেভাবে আমরা শিকার করার উদ্দেশ্যে বনে জঙ্গলে যাই যেখানে বাঘ আর বিষধর সাপ থাকে এবং সেগুলোর ভয় আমাদেরকে শিকার করা থেকে বিরত রাখে, একইভাবে পাপ থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব যদি আমাদের মাঝে এই দৃঢ় বিশ্বাস

জন্ম নেয় যে, আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি বড়ই কঠিন। আর যদি আমরা পাপ করি তবে তার শাস্তির আওতায় আসতে পারি। তিনি বলেন, লোহাই লোহাকে কর্তন করতে পারে। খোদাতা'লার মাহাত্ম্য ও প্রতাপে সেই দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে যা ঔদাসিন্যের আবরণকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে আর শরীরে এক কাঁপুনি ধরিয়ে দেবে এবং মৃত্যুকে একেবারে কাছে দেখাবে এবং নাফসে আম্মারা তথা কুপ্ররোচনা দানকারী আত্মার সকল প্ররোচনা দূরীভূত হওয়ার মতো খোদাভীতি দান করবে আর মানুষ একটি অদৃশ্য হাতের মাধ্যমে খোদাতা'লার প্রতি আকৃষ্ট হবে আর তার হৃদয় এই দৃঢ় বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে যে, প্রকৃত অর্থেই খোদা বিদ্যমান রয়েছেন যিনি দুঃসাহসী অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেন না। কাজেই প্রকৃত অর্থে পবিত্রতা অন্বেষণকারী এক ব্যক্তি এমন গ্রন্থ দিয়ে কি করবে যার মাধ্যমে এসব প্রয়োজন পূর্ণ হয় না? তাই আমি প্রত্যেকের কাছে এই বিষয়টি স্পষ্ট করছি যে, যেই গ্রন্থ এসব প্রয়োজন পূর্ণ করে তা হলো কুরআন শরীফ। এর মাধ্যমে খোদাতা'লার প্রতি মানুষের আকর্ষণ সৃষ্টি হয় আর পার্থিব জগতের ভালোবাসা লোপ পায় আর খোদা, যিনি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অস্তিত্ব, তাঁর আনুগত্য করার মাধ্যমে তিনি অবশেষে তার স্বরূপ প্রকাশ করেন আর সেই সর্বময় ক্ষমতাকে অন্যান্য জাতি জানে না, কুরআনের আনুগত্যকারী মানুষকে খোদা তা'লা স্বয়ং তা দেখিয়ে দেন। এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, কুরআনের অনুসারী মানুষকে খোদা স্বয়ং (এটি) দেখিয়ে থাকেন এবং ঐশী জগতে তাকে ভ্রমণ করান আর 'আমি আছি' ধ্বনির মাধ্যমে স্বীয় অস্তিত্বের সংবাদ তাকে দেন।

কাজেই এই হলো সেই উপলব্ধি ও বুৎপত্তি যা কুরআন শরীফ সম্পর্কে থাকতে হবে। এটি সেই শিক্ষার ব্যবহারিক দিক যা আমাদের কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া উচিত, নতুবা অন্যান্য ধর্মের মতো আমাদের ঈমানের দাবি নিছক মৌখিক কথাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এখানে এসে তিনি (আ.) বলেন, এই গ্রন্থ সংশোধন করে আর অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ তা করে না। সেসব গ্রন্থে যেহেতু পরিপূর্ণ শিক্ষা নেই, একারণে (তারা সংশোধন) করে না। আর যদি আমরা কুরআন করীমের অনুসারী হয়েও সংশোধিত না হই, তাহলে দোষ আমাদের নিজেদেরই, কেননা যেভাবে তিনি (আ.) বলেছেন, পরিপূর্ণ আনুগত্য করা আবশ্যক। পরিপূর্ণ আনুগত্য যদি করা না হয় তবে সংশোধন হবে কীভাবে? সেটির ওপর আমল না করলে সংশোধন কীভাবে হবে? কাজেই আমাদের চেষ্টা করা উচিত যেন আমরা পরিপূর্ণ আনুগত্যকারী হই। আল্লাহ্ তা'লা এই সৌভাগ্য আমাদের দান করুন। এরপর তিনি (আ.) বলেন,

আমাদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ এবং যারা আমাদের পূর্বে গত হয়ে গিয়েছে তাদের সবার অভিজ্ঞতা একথার সাক্ষী যে, কুরআন শরীফ নিজ আধ্যাত্মিক বিশেষত্ব ও নিজ জ্যোতি দ্বারা এর সত্যিকার অনুসারীদের এর দিকে আকৃষ্ট করে আর তার হৃদয়কে আলোকিত করে। এরপর বড় বড় নিদর্শন প্রদর্শন করে খোদার সাথে এত দৃঢ় সম্পর্কবন্ধনে আবদ্ধ করে দেয় যে, সেটি টুকরো টুকরো করতে চায় এমন তরবারির আঘাতেও ছিন্ন হয় না। এটি (অর্থাৎ কুরআন) হৃদয়ের চোখ উন্মুক্ত করে দেয় আর পাপের নোংরা নর্দমার পথ রুদ্ধ করে দেয় আর খোদাতা'লার সাথে তৃপ্তিকর বাক্যালাপে সম্মানিত করে, আর তাকে অদৃশ্যের সংবাদ দান করে আর তার দোয়া গৃহিত হলে এ বিষয়ে তাকে সংবাদ দেয়া হয় আর প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে পবিত্র কুরআনের সত্যিকার অনুসারীর মোকাবিলা করে, খোদা তা'লা নিজ ভয়াবহ

নিদর্শন দ্বারা তার কাছে প্রকাশ করে দেন যে, তিনি সেই বান্দার সাথে আছেন যে তাঁর বাণীর অনুসরণ করে।

অতএব সত্যিকার অনুসারী হওয়া হলো মৌলিক শর্ত। পবিত্র কুরআন শিরক থেকে পরিত্রানের মাধ্যম– এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

পবিত্র কুরআন তৌহিদের যে বীজ আরব, পারস্য, মিশর, সিরিয়া, হিন্দ, চীন, আফগানিস্তান, কাশ্মীর ইত্যাদি দেশে বপন করেছে আর অধিকাংশ দেশ থেকে প্রতিমা পূজা ও অন্যান্য সৃষ্টিপূজার বীজ গোড়া থেকে উৎপাটন করেছে– এটি এমন এক কাজ যার দৃষ্টান্ত কোনো যুগে পাওয়া যায় না।

শুরুতে যখন ইসলাম বিস্তৃত হয়েছে আর এসব দেশে শিরক নির্মূল হয়েছে, তো এটি পবিত্র কুরআনের শিক্ষার ওপর আমল করার কারণে ছিল আর একারণেই আমাদের পিতৃপুরুষরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু আমরা যদি এর ওপর আমল না করি তাহলে আমরা পুনরায় সেই অজ্ঞতায় ফিরে যাচ্ছি। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অতি উন্নত মানের শিক্ষা– এ সম্পর্কে তিনি বলেন,

যে গ্রন্থ বিশ্বের সূচনালগ্নে এসে থাকবে তার সম্পর্কে বিবেক সুনিশ্চিৎভাবে এটিই বলবে যে, সেটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ হবে না। অর্থাৎ শুরুতে অবতীর্ণ গ্রন্থ সম্পর্কে মানব বিবেক এটিই বলবে যে, সেটি পরিপূর্ণ হতে পারে না। বরং সেটি কেবল সেই শিক্ষকের ন্যায় হবে যে শিশুশ্রেণীর শিশুদের অ আ শিক্ষা দেয়। শিশুদের অ আ ক খ শেখায়। জানা কথা যে, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অনেক যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দিতে, তাদেরকে A B C এবং অ আ শেখাতে অনেক বেশি যোগ্যতা থাকার প্রয়োজন নেই। তবে হ্যাঁ, যেই যুগে মানবীয় অভিজ্ঞতা উন্নতি করেছে আর মানবজাতি বিভিন্ন প্রকার ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছে তখন সূক্ষ্ম শিক্ষার প্রয়োজন হয়েছে। বিশেষত যখন অজ্ঞতার অন্ধকার পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, মানুষ বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানগত ও ব্যবহারিক অমানিশায় নিপতিত হয়েছে তখন এক উন্নত ও সম্পূর্ণ শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে আর তা হলো পবিত্র কুরআন। কিন্তু প্রাথমিক যুগের গ্রন্থের জন্য উন্নত মানের শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না। কেননা তখনও মানবজাতি সহজ-সরল ছিল। আর তখন পর্যন্ত তাদের মাঝে কোনো অন্ধকার ও অজ্ঞতা স্থান নেয় নি। তবে হ্যাঁ, সেই গ্রন্থের জন্য উন্নত শিক্ষার প্রয়োজন ছিল যা চরম অজ্ঞতার যুগে অবতীর্ণ হয়েছে আর মানুষের সংশোধনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে যাদের হৃদয়ে নৈরাজ্যমূলক বিশ্বাস গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল আর ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা তখন অবতীর্ণ হয়েছে যখন মানবীয় মেধা পরিপক্ক হয়ে গিয়েছিল ও বুঝতে শিখেছিল এবং মন্দও চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, আর মানুষ তাতে নিমজ্জিত হচ্ছিল। তখন তার মেধা অনুযায়ী শিক্ষাও অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তিনি বলেন,

পবিত্র কুরআন যে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য একটি গ্রন্থ সে সম্পর্কে স্মরণ রেখো, এই কথা প্রকৃত অর্থেই সঠিক ও সত্য যে, সৃষ্টির সূচনাতেও মানবজাতি একটি এলহামী গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছিল। এখানে কেউ যদি এই প্রশ্ন করে যে, সৃষ্টির সূচনাতে কেবল একটি ঐশী গ্রন্থ মানবজাতিকে কেন দেয়া হলো, প্রত্যেক জাতির জন্য পৃথক পৃথক গ্রন্থ কেন দেয়া হলো না। এর উত্তর হলো এই যে, সৃষ্টির সূচনাতে মানুষের সংখ্যা স্বল্প ছিল। অধিকন্তু সেই সংখ্যা থেকেও স্বল্প ছিল যে, তাদেরকে একটি জাতি বলা যেতে পারে। তাই তাদের জন্য কেবল একটি গ্রন্থই যথেষ্ট ছিল। এরপর মানুষ যখন পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে আর পৃথিবীতে

বসবাসকারীদের প্রতিটি অংশ এক একটি জাতিসত্তায় পরিণত হয় আর দীর্ঘ দূরত্বের কারণে এক জাতি অপর জাতির অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত রয়ে যায় এমন যুগে খোদা তা'লার প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার দাবি ছিল প্রত্যেক জাতিকে পৃথক পৃথক রসূল ও ঐশী গ্রন্থ দেয়া। অতএব এমনই হয়েছে। আর এরপর মানুষ যখন পৃথিবীতে জনসংখ্যার ক্ষেত্রে উন্নতি করে আর যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং এক দেশের লোকেরা অন্য দেশের লোকদের সাথে সাক্ষাতের উপকরণ লাভ করে আর এই কথা জানা যায় যে, পৃথিবীর অমুক অমুক স্থানে মানুষ বসবাস করে আর খোদা তা'লা তাদের সবাইকে পুনরায় এক জাতিতে পরিণত করার ইচ্ছা করলেন আর বিভেদের পর পুনরায় তাদেরকে একত্রিত করতে চাইলেন, তখন খোদা তা'লা সকল দেশের জন্য একটিমাত্র গ্রন্থ অবতীর্ণ করেন আর সেই গ্রন্থে এই নির্দেশ দেন যে, যখন এই গ্রন্থ বিভিন্ন দেশে পৌঁছবে তখন তাদের জন্য আবশ্যক হবে সেটিকে গ্রহণ করা এবং তাতে ঈমান আনয়ন করা আর সেই গ্রন্থ হলো পবিত্র কুরআন যা সকল দেশের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধন স্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনের পূর্বে সকল গ্রন্থ নির্দিষ্ট জাতির জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ সেগুলো কেবল একটি জাতির জন্যই অবতীর্ণ হতো। অতএব সিরীয়, পারসীয়, হিন্দী, চীনি, মিশরীয়, রোমান এই সমস্ত জাতির জন্য যেসব গ্রন্থ বা রসূল এসেছে তারা কেবল তাদের জাতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। ভিনজাতির সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ও সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু সবার শেষে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যা এক আন্তর্জাতিক ধর্মগ্রন্থ। আর এটি কোনো বিশেষ জাতির জন্য নয়, বরং সকল জাতির জন্য (অবতীর্ণ হয়েছে)। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআন এমন এক উম্মতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে যারা ধীরে ধীরে এক জাতিসত্তায় পরিণত হতে চাচ্ছিল। অতএব এখন এমনসব উপকরণ হস্তগত হয়েছে যা বিভিন্ন জাতিকে ঐক্যের রঙে রঙীন করে যাচ্ছে। পারস্পরিক সাক্ষাৎ, যা এক জাতিতে পরিণত হওয়ার মূল শিকড়, তা এত সহজ হয়ে গেছে যে, বছরের দূরত্ব কয়েক দিনে অতিক্রম করা সম্ভব আর বার্তা পৌঁছানোর জন্য এমনসব মাধ্যম সৃষ্টি হয়েছে যে, যেখানে এক বছরেও কোনো দূরদূরান্তের এলাকার সংবাদ পাওয়া সম্ভব হতো না তা এখন এক মুহূর্তে পৌঁছতে পারে। যুগে এমন এক মহাবিপ্লব সাধিত হচ্ছে আর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি এমন এক দিকে মোড় নিয়েছে যা থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, এখন খোদা তা'লার অভিপ্রায় হলো পৃথিবীতে বিস্তৃত সকল জাতিকে তিনি এক জাতিতে পরিণত করবেন আর হাজার হাজার বছর যাবৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা মানুষদের পুনরায় পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দিবেন। আর এই সংবাদ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। আর পবিত্র কুরআনই স্পষ্টভাবে এই দাবি করেছে যে, তা পৃথিবীর সকল জাতির জন্য এসেছে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (সূরা আরাফ: ১৫৯)। অর্থাৎ তুমি সবাইকে বলে দাও যে, আমি তোমাদের সবার জন্য রসূলরূপে আবির্ভূত হয়েছি। অতঃপর বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (সূরা আম্বিয়া: ১০৮)। অর্থাৎ আমি সমস্ত জগতের জন্য তোমাকে রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি। আর এরপর বলেন, لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (সূরা ফুরকান: ০২)। অর্থাৎ আমরা (তোমাকে) এজন্য প্রেরণ করেছি যেন তুমি সমস্ত জগদ্বাসীকে সতর্ক করো। কিন্তু আমরা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলছি যে, পবিত্র কুরআনের পূর্বে পৃথিবীর কোনো ঐশী গ্রন্থ এই দাবি করেনি, বরং প্রত্যেকে নিজ বাণীকে নিজ জাতি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রেখেছে। এমনকি যে নবীকে খ্রিষ্টানরা খোদা আখ্যা দিয়েছে তার মুখ

থেকেও এটিই বের হয়েছে যে, আমি ইসরাঈলের মেষদের ব্যতিরেকে অন্য কারো প্রতি প্রেরিত হইনি। হযরত ঈসা (আ.) বাইবেলে এটিই বলেছিলেন। আর বর্তমান যুগের পরিস্থিতিও সাক্ষ্য দিয়েছে যে, পবিত্র কুরআনের সার্বজনীন প্রচারের এই দাবি একান্ত সময়োপযোগী, কেননা মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের সময় সার্বজনীন প্রচারের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

অতঃপর পবিত্র কুরআনের আগমনের চারটি কারণ রয়েছে, অর্থাৎ 'ইলালে আরবা' তথা 'চার কারণ' রয়েছে একথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

প্রতিটি বস্তুর চারটি ইল্লত তথা কারণ হয়ে থাকে। অর্থাৎ উপকরণ বা কারণ হয়ে থাকে। আর সেই চারটি কারণ হলো এই, সেই চারটি কারণ কী? ইল্লতে ফায়েলী তথা নিমিত্ত কারণ। অর্থাৎ এটির সম্পাদনকারী কে আর এর কারণ সমূহ (কী)? ইল্লতে সূরী তথা আকারগত কারণ। অর্থাৎ এর বাহ্যিক ও ব্যবহারিক কারণ সমূহ কী? ইল্লতে মাদী তথা উপাদানগত কারণ। অর্থাৎ এর উপাদানগত লাভ-ইবা কী? ইল্লতে গায়ী তথা উদ্দেশ্যগত কারণ। অর্থাৎ এর মূল কারণ এবং এসব জিনিসের মৌলিক ও সামগ্রিক কারণ কী? এই পর্যায়ে তিনি পবিত্র কুরআনের চারটি ইল্লত তথা কারণের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এই গ্রন্থের ইল্লতে ফায়েলী তথা নিমিত্ত কারণ হলো الٓمٓ। আর আমার মতে الٓمٓ এর অর্থ হলো, اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ। অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ হলাম সেই সত্তা যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা জানেন যে, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী। আর ইল্লতে মাদী তথা উপাদানগত কারণ হলো ذٰلِكَ الْكِتٰبُ। অর্থাৎ এই গ্রন্থ খোদা তা'লার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে যিনি সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন। এর ওপর আমল করে এর দ্বারা বড় বড় কল্যাণ লাভ করা সম্ভব। আর ইল্লতে সূরী তথা আকারগত কারণ হলো لَا رَيْبَ فِيْهِ। অর্থাৎ এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ও পরাকাষ্ঠা হলো এই যে, এতে কোনো ধরনের সন্দেহ ও সংশয় নেই। এটি এত চমৎকার শিক্ষা যার কোনো তুলনাই নেই। এর সব কথা সুদৃঢ় এবং সব দাবি যুক্তিপূর্ণ ও উজ্জ্বল। আর এই গ্রন্থের ইল্লতে গায়ী তথা উদ্দেশ্যগত কারণ হলো هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ। অর্থাৎ এই গ্রন্থের অবতীর্ণ হওয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো এটি মুত্তাকীদের হেদায়েত দেয়া। আর এটিই এক প্রকৃত গ্রন্থের বা ধর্মীয় গ্রন্থের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

অতঃপর সূরা বাকারার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতের অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

তাকওয়াকে এমন উন্নত মানের প্রয়োজনীয় বিষয় আখ্যা দেয়া হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনের ইল্লতে গায়ী তথা উদ্দেশ্যগত কারণ এটিকেই নির্ধারণ করা হয়েছে। অতএব দ্বিতীয় সূরার প্রারম্ভেই বলা হয়েছে,

الٓمٓ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

আমার বিশ্বাস এটিই যে, পবিত্র কুরআনের এই বিন্যাসে বড়ই মাহাত্ম্য বিদ্যমান। খোদা তা'লা এখানে 'ইলালে আরবা' তথা 'চার কারণের' উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ চারটি উপাদান বা কারণের (উল্লেখ করেছেন)। ইল্লতে ফায়েলী তথা নিমিত্ত কারণ, ইল্লতে মাদী তথা উপাদানগত কারণ, (ইল্লতে) সূরী তথা আকারগত (কারণ) এবং (ইল্লতে) গায়ী তথা উদ্দেশ্যগত কারণ। প্রতিটি জিনিসের সাথে এই চারটি কারণই থাকে। পবিত্র কুরআন একান্ত

পরিপূর্ণরূপে এটিকে প্রদর্শন করে। الم-এর মাঝে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা, যিনি সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন, এই বাণীকে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন অর্থাৎ খোদা হলেন এর ফায়েল (বা কর্তা)। ذٰلِكَ الْكِتٰبُ-তে উপাদানের কথা বলেছেন। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন অথবা বলা উচিত যে, এটি ইল্লতে মাদী তথা উপাদানগত কারণ। অর্থাৎ উপাদান হিসেবে আমাদের কাছে যে গ্রন্থ রয়েছে তা-ও এমন গ্রন্থ, যার ওপর আমল করে মানুষ নিজ লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। ইল্লতে সূরী তথা আকারগত কারণ হলো لَا رَيْبَ فِيهِ। প্রতিটি জিনিসে সন্দেহ ও সংশয় এবং নৈরাজ্যমূলক কুধারণা সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু পবিত্র কুরআন এমন এক গ্রন্থ যে, এতে কোনো সন্দেহ নেই, কোনো সংশয় নেই। এ কারণেই لَا رَيْبَ বলা হয়েছে। এখন যখনকিনা আল্লাহ্ তা'লা এই কিতাবের মাহাত্ম্য এটি বলেছেন যে, لَا رَيْبَ فِيهِ। তখন প্রকৃতিগতভাবেই সকল ভদ্র প্রকৃতির ও সৌভাগ্যবানদের আত্মা আনন্দিত হবে আর এই আশা করবে যেন এর নির্দেশাবলীর ওপর আমল করতে পারে। আমরা পরিতাপের সাথে বলছি যে, পবিত্র কুরআনের উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ মাহাত্ম্যকে জগতের সামনে উপস্থাপন করা হয় না। নতুবা পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য এবং এর পরাকাষ্ঠা আর এর সৌন্দর্য নিজের মাঝে এমন এক আকর্ষণ শক্তি রাখে যে, মানব-হৃদয় অবলীলায় এর পানে ধাবিত হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি একটি সুন্দর বাগানের প্রশংসা করা হয় আর তার সুগন্ধিযুক্ত গাছপালা এবং হৃদয়কে সতেজকারী লতাগুল্ম, (তাতে) চলার পথ, আর স্বচ্ছ পানির বয়ে যাওয়া নদনদীর উল্লেখ করা হয় তাহলে প্রত্যেকেই আন্তরিকভাবে সেখানে ভ্রমণ উপভোগ করা পছন্দ করবে। আর যদি এটিও বলা হয় যে, তাতে কতিপয় এমন ঝরনাধারাও প্রবাহিত রয়েছে যেগুলো পুরোনো ও প্রাণঘাতি ব্যাধি থেকে নিরাময় দান করে তাহলে আরো বেশি উচ্ছ্বাস ও আগ্রহের সাথে মানুষ সেখানে যাবে। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও পরাকাষ্ঠাকে যদি একান্ত সুন্দর ও প্রভাববিস্তারী ভাষায় বর্ণনা করা হয় তাহলে আত্মা পূর্ণ উচ্ছ্বাসের সাথে তার পানে ধাবিত হয়। আর প্রকৃত অর্থেই আত্মার প্রশান্তি ও তৃপ্তির উপকরণ এবং সেই বিষয়, যার দ্বারা আত্মার প্রকৃত প্রয়োজন পূর্ণ হয়, তা হলো পবিত্র কুরআন। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ। অর্থাৎ (এটি) মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত। আর অন্যত্র বলেছেন, لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ (সূরা ওয়াকেয়া: ৮০)। অর্থাৎ যাদেরকে পবিত্র করা হয়েছে তারা ব্যতিরেকে আর কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না। তিনি বলেন, এর অর্থ হলো সেসব মুত্তাকী যাদের কথা هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ-এ বলা হয়েছে। এ থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, কুরআনী জ্ঞানের প্রকাশ হওয়ার জন্য শর্ত হলো তাকওয়া। কিন্তু বর্তমান যুগের তথাকথিত আলেমরা, যারা তাকওয়াশূন্য, (তারা) এর শিক্ষাকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছে যে, ইসলাম বিরোধীরা এর শিক্ষার ওপর আরো আপত্তি করার আরো সুযোগ লাভ করেছে। কিন্তু আজ এটি আমাদের তথা আহমদীদের কাজ যেন আমরা নিজেদের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি করে এই শিক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলীকে নিজেদের কথা ও কাজ দ্বারা বাস্তবায়িত করে দেখাই, এগুলোর ওপর আমল করে দেখাই। জগদ্বাসীকে যেন আমরা অবহিত করি যে, পবিত্র কুরআনই সকল প্রকার ব্যাধির চিকিৎসা। আর এর প্রেরণকারী হলেন সেই খোদা যিনি এটিকে উদ্দেশ্যপূর্ণ করে জগদ্বাসীর সংশোধনের জন্য অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাকওয়ার পথে পদচারণা করে এর ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন।

এগুলো অনেক গভীর বিষয়াদি। অনেক মনোযোগের সাথে শোনা উচিত এবং অনেক আগ্রহের সাথে এগুলোর ওপর আমল করা উচিত। আমাদের গভীর প্রণিধানের সাথে পবিত্র কুরআন পাঠ করা উচিত।

এখন আমি দোয়ার তাহরীকও করতে চাই। বাংলাদেশে আজকাল সালানা জলসা হচ্ছে। আজই তাদের প্রথম দিন ছিল। কিন্তু সেখানে বিরোধীরা আক্রমণ করেছে, জলসাগাহ্‌তেও আক্রমণ করেছে। বহু লোক সেখানে আহতও হয়েছে। আমার ধারণা যে, বাহির থেকে তারা এমনভাবে আক্রমণ করেছে যার ফলে (মানুষ) আহত হয়েছে, (তাদের) কেউ কেউ গুরুতর আহতও রয়েছে। এছাড়া সেই এলাকায় যেসব আহমদী ছিল এখন পর্যন্ত পাওয়া সংবাদ অনুযায়ী তাদের ঘরবাড়িও পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা এখনও পুরোপুরি জানা যায়নি। আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদেরকে তাদের (অর্থাৎ বিরোধীদের) অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখুন আর তাদেরকে ধৃত করার উপকরণ সৃষ্টি করুন। তাদের জন্য হেদায়েতের কোনো দোয়া তো হতে পারে না।

আল্লাহুম্মা মায্‌যেকহুম কুল্লা মুমায্‌যাকিন ওয়া সাহ্‌হিকহুম তাসহীকা– এই দোয়াই তাদের জন্য আমাদের মুখ ও হৃদয় থেকে বের হয়।

অনুরূপভাবে পাকিস্তানের পরিস্থিতির জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সেখানেও আহমদীদের অবস্থার উন্নতি দিন।

বুরকিনা ফাসোতেও এখন পর্যন্ত বিপদ মাথার ওপর রয়েছে। সেখানকার জন্যও দোয়া করুন।

একইভাবে আলজেরিয়াতেও আহমদীদের ওপর কতিপয় মামলা রয়েছে। তাদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সকল স্থানে আহমদীদের সুরক্ষিত রাখুন।

বাংলাদেশে যেমনটি আমি বলেছি, প্রশাসন আমাদেরকে এটিই বলেছিল যে, চিন্তা করবেন না। জলসা করুন, আমরা পূর্ণ নিরাপত্তা দেবো। কিন্তু যখন দাঙ্গাবাজ ও সন্ত্রাসী আর উগ্রপন্থী মোল্লারা তাদের মিছিল নিয়ে আসে তখন পুলিশ সেখানে দর্শকের ন্যায় বসেছিল এবং কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। যাহোক আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত হতে হবে, আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই ভাইদের বিপদ দ্রুত দূর করুন। (আমীন)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)